আমার পিজিতে এম ফিল পড়া-১ম অংশ

বাংলদেশে তখন মেডিকেল সাইন্সে উচ্চতর বা পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রী পড়ার একমাত্র প্রতিসঠান ছিল ঢাকার শাহবাগের আইপিজিএম আর। সংক্ষেপে সবাই পিজি বলত। এখানে এম ফিল ও এফসিপিএস কোর্স পড়ানো হত। ইন্সটিটিউটটি ছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটির অধীন। প্রতিবছর মাত্র কয়েকজন করে ছাত্র এখানে ভর্তি হত। অনেক কম্পিটিশন ছিল ভর্তি পরীক্ষায়। ১৯৯৩ জুলাই সেসনে লিখিত ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে পাস করলাম। বিকেলেই ময়মনসিংহ চলে গেলাম শাহ মনির স্যার ও মীর্জা হামিদুল হক স্যারের দোয়া নিতে। ভাইভা রুমে ঢুকলাম। বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন প্যাথলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক বি আর খান স্যার। এক্সটারনাল ছিলেন সর্বজন স্বীকৃত প্যাথলজি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রধ্যেয় কে এম নজরুল ইসলাম স্যার। পাসে সোফাসেটে বসা ছিলেন দ্বীতিয় জেনারেশানের কয়েকজন স্যার। সব স্যারগনকে আমি সাইজে বড় বড় দেখছিলাম। এটা ভয়ের কারনেও হতে পারে। নজরুল ইসলাম স্যার প্রশ্ন করলেন

-আপনি পাস করেছেন ১৯৮৫ সনে। ইন্টারনি শেষ করেছেন ৮৬ সনে। এখন ৯৩ সন। এতদিন কি করলেন।

-স্যার, আমি উপজেলায় মেডিকেল অফিসার হিসাবে কাজ করেছি। গত এক বৎসর ছয় মাস ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের প্যাথলজির প্রভাষক ছিলাম।

-আমি জানতে চাচ্ছি আপনি কোর্সে ঢোকার জন্য চেষ্টা করেছেন কিনা।

-প্রতিবারই চেষ্টা করেছি কিন্তু চাঞ্চ পাই নি।

-নিশ্চয়ই মেডিসিন বা সার্জারি!

-না স্যার, হিস্টোপ্যাথলজি।

-এত ভাল ভাল সাব্জেক্ট থাকতে প্যাথলজি পড়তে চান কেন?

-স্যার, আমার ভাল লাগে।

-কেন লাগে?

-স্যার, আমি একজন শান্ত শিষ্ট সভাবের মানুষ। হই চই আমার পছন্দ না।

-কি বললেন? হই চই?

-সরি স্যার। মানে আমি উপজেলায় চাকরি করতে গিয়ে দেখেছি আমি পাবলিকের ঝামেলা ম্যানেজ করতে পারি না। আমার জন্য মেডিসিন সার্জারি সুইটেবল না। প্যাথলজিতে ক্যারিয়ার করতে পারলে আমি ভাল পারফর্ম করতে পারব। নিরিবিলিতে বসে অনেক কাজ করতে পারব। পাবলিকের কন্টাক্ট কম।

বি আর খান স্যার জিজ্ঞেস করলেন

-আপনি এখন কোথায় আছেন?

-স্যার, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের প্যাথলজি বিভাগের প্রভাষক।

-ওখানে কি করেন?
-টিউটোরিয়াল ক্লাস নেই, ক্লিনিক্যাল প্যাথলজি ল্যাবে রিপোর্ট করি, লাইব্রেরীতে পড়ি, স্যারদের থেকে স্লাইড দেখা শিখি এবং সেমিনার সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করি।
-কে শিখায় আপনাকে?
-প্রফেসর শাহ মুনির হোসেন, প্রফেসর মীর্জা হামিদুল হক ও প্রফেসর জামসেদ হায়দার সিদ্দিকী স্যার। আমি তাদের লেকচার ক্লাসেও এটেন্ড করি।
-ওখানকার হেড কে?
-প্রফেসর শাহ মুনির হোসেন।
এরপর বি আর খান স্যার নজরুল ইসলাম স্যার অনুরোধ করলেন আমাকে প্রশ্ন করার জন্য। তিনি স্পষ্ট ইংরেজিতে প্যাথলজি সাব্জেক্ট থেকে কিছু প্রশ্ন করলেন। আমিও স্পষ্ট ইংরেজিতে প্রায় সব প্রশ্নের উত্তর দিলাম। সাইডে পিছনের সোফায় বসা প্রফেসর আবু উবায়েদ মুহাম্মদ মহসিন স্যার বলে ওঠলেন "স্যার, এই ছেলেই পারবে।" একটু হিউমার শুনা গেল। আমাকে আসতে বলা হল। দরজা দিয়ে বের হবার সময় শুনলাম এক স্যার বলছেন ওনারা বলেছেন" যে ছেলেকে আমরা পাঠিয়েছি সে খুব ভাল। পারবে। " বুঝে ফেললাম আমার হবে। রাতে রেজাল্ট হল। আমি এম ফিল প্যাথলজি কোর্সে চাঞ্চ পেয়ে গেলাম। আমার আনন্দ আর ধরায় না।
আমার এমবিএস ক্লাস মেট এবং কলিগ বন্ধু ডাঃ একেএম মুসা শাহীন মাইক্রোবায়োলজি এবং ক্লাসমেট বন্ধু ডাঃ মোহাম্মদ আলী খান বায়োকেমিস্ট্রি এম ফিল কোর্সে চাঞ্চ পেলো। ডাঃ মুসা এখন দিনাজপুর মেডিকেল কলেজের প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান। ডাঃ খান এখন প্রফেসর ও টাংগাইল মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল।

জুলাই মাসে ক্লাস শুরু হল। তখনো হোস্টেলে সীট এলটমেন্ট দেয়া হয় নি। শেষ ব্যাচের ফাইনাল পরীক্ষা হলেই সীট খালি হবে এবং এলটমেন্ট পাওয়া যাবে। কিন্তু ততদিন থাকব কোথায়?
বায়োকেমিস্ট্রি এম ফিল থিসিস ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে আমার এম-১৭ ব্যাচের বন্ধু ডাঃ খোরশেদ আলম। পরে সে জাপান থেকে পি এইচ ডি করে আমেরিকায় সেটল হয়েছে। তাকে আমার থাকার সমস্যার কথা জানালাম। সে বলল "আমাকে এখন তেমন রুমে থাকতে হয় না। তুমি এলটমেন্ট পাওয়ার আগ পর্যন্ত থাক। " আমি তার সীটে থাকা শুরু করলাম। এমবিবিএস এ আমার এক বছরের জুনিয়ার এম-১৮ ব্যাচের ডাঃ নওফেল ইসলাম আমার রুম মেট। এখন সে প্যাথলজি বিভাগের প্রফেসর। ডাঃ নওফেল এম ফিল এ আমার এক বছরের সিনিয়র। তাই তাকে বড় ভাইয়ের মত মানা শুরু করলাম। তার ভাব সাবও বড় ভাইয়ের মত। বেশী কথা বলে না। সব সময় পড়া নিয়ে সিরিয়াস। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আমার বেডের কাছে আমি এক জোড়া আমার চামের সেন্ডেল রাখতাম। আমার বেড ছিল দরজার কাছে। নওফেলের বেড ছিল ভিতরের দিকে। রুমে ঢুকেই সে আমার সেন্ডেল গুলি তার পা দিয়ে লাথি দিয়ে তার বেডের কাছে নিয়ে রাখত। তাতে আমি অপমান

বোধ করতাম। প্রায়ই এইরকম করত। মানসিক ভাবে কষ্ট পেতাম। একটা জুনিয়র ছেলে আমার সেন্ডেল লাথি মেরে নিয়ে যায় তার বেডের কাছে। হউক সে এম ফিলএ সিনিয়র। আমি তো তার বেডে থাকি না। তার এত পাওয়ার কেন? একদিন সে বেডে শুইয়ে আছে।আমিও খোরশেদের বেডে শুয়ে আছি। ফ্যানের বাতাসে তার বিছানার চাদরের ঝুলন্ত অংশ উপরের দিকে উড়াতে খাটের নিচে দেখতে পেলাম হুবহু একই রকম আরেক জোড়া সেন্ডেল। আমি বললাম
-নওফেল, তুমি আমার সেন্ডেল কেন বার বার তোমার বেডের কাছে নিয়ে রাখ?
-কই, এটাতো আমার সেন্ডেল।
-না, এটা আমার সেন্ডেল। তোমারতা তোমার খাটের নিচেই আছে। ঐ যে দেখ।
-তাই নাকি। এ, তাইতো। এত দিন তো আমি মনে করেছি সাদেক ভাই আমার সেন্ডেল নিয়ে শেয়ার করছে। সরি ভাই। আমি এক্সট্রিম্লি সরি।
-হে, হে, হে। তার মানে এতদিন তুমি মনে করেছ সাদেক ভাই উড়ে এসে জুরে বসে তোমাকে ডিস্টার্ব করেছে।
-সেই রকমই তো হল। সরি ভাই।
আসলে নওফেল খুব ভাল ছেলে। ও কোর্সে থাকতে আমাকে অনেক শিখায়েছে।

অফিসিয়ালি সীট এলটমেন্ট হল। যারা চালাক চতুর ছিল তারা অরিজিনাল সীট পেল। আমি পেলাম হার্ড বোর্ড দিয়ে বেড়া দেয়া সীট। অরক্ষিত রুম। হার্ড বোর্ডের এক পাল্লা দরজা। বেড়ার উপর দিয়ে খোলা। ইচ্ছা করলে বেড়া টপকিয়ে চোর ভিতরে ঢুকতে পারে। রুমে দুইটি খাট। দুই খাটের মাঝখানে একটি চৌকি ঢুকিয়ে দুইজন বেকার ডাক্তার থাকে। বাইরে অল্প প্রাক্টিস করে। বাকী সময় লাইব্রেরিতে পড়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট এডমিশন টেস্ট দেয়ার প্রস্তুতির জন্য। এটা তখন প্রচলিত ছিল। আমার ৪ বছরের সিনিয়র এক ভাই এলেন।বললেন
-সাদেক ভাই, আমি অনেক দূরে ইউনিয়ন লেভেলে পোস্টিং নিয়েছি। টি এইচ এ সাহেবের পারমিশন নিয়ে এসেছি। আমি তিন মাস আপনার রুমে থাকব এফ সি পি এস এডমিশন প্রস্তুতি নেয়ার জন্য।
-আমার রুমে এক্সট্রা দুইজন থাকে। আপনি কেমনে থাকবেন?
-আমি আপনার ফ্লোরে রাত ১১ টায় বিছানা ফেলব, সকাল ৬ টায় বিছানা গুটায়ে চলে যাব। সারাদিন আমাকে পাবেন না। শুধু রাতে ঘুমাতে আসব।
-আমি আপনার বিছানার উপর দিয়ে যেতে পারব না। আমাকে রাতে একবার বাথ রুমে যেতে হয়। যদি থাকেন আমি ফ্লোরে থাকব আপনি আমার বেডে থাকবেন। আমি আপনার ছোট।
-তা হয় না। এই রুম আপনার। আপনাকে কিছুতেই আমি ডিস্টার্ব করব না।
তাই হল। আমি তার পেটের উপর দিয়ে ডিংগিয়ে রাতে বের হতাম। সেই ভাই পরে এফ সি পি এস পাস করে মস্ত বড় সার্জন হয়েছেন।
আমার মনে জেদ ছিল। বন্ধুরা আমাকে ঠকিয়ে ভাল রুম নিয়েছে। আমাকে দিয়েছে হার্ড বোর্ডে। ইনশা

আল্লাহ, আমি এই রুমে থেকেই সময়মত এম ফিল পাস করে বের হয়ে যাব। তাই হয়েছে।
বাথরুম ছিল বেডরুম থেকে অনেক দূরে। একদিন বাথরুমে গোসল করছিলাম। বাথ রুমের ওয়ালের উপর শুক্লা লুঙ্গি ঝুলিয়ে রেখে অনেকক্ষন গোসল করছিলাম। ওয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখি শুক্লা লুঙ্গী নেই। গামছা নেই। পরনে ভিজা লুঙ্গী। আমি ডাকি "এই, লুঙ্গী কে নিলে? ফাইজলামি কইরো না। সময় নাই। তাড়াতাড়ি লুঙ্গী দাও।"
কোন সাড়াশব্দ নেই। দরজা খুলে বাইরে এসি দখি কেউ নেই। ভিজা লুঙ্গী পরে রুমে আসলাম। রুমে এসে রুম মেটকে জানালাম। রুম মেট বলল "ঠিক আছে, আমার লুঙ্গী পরেন। " দেখা গেল আলনায় কারো লুঙ্গী নেই। কিন্তু পেন্ট শার্ট আছে। তা হলে কি হল?
রুম মেট বলল একটু আগে আমি তালা খুলে রুমে ঢুকি। একটা ছেলে মুস্কি হেসে রুম থেকে বের হয়ে গেল। আমি মনে করলাম সাদেক ভাইর গেস্ট। এখন ভাবছি সে তালামারা রুমে ছিল কেন? তাহলে সে চোর ছিল। বেড়া টপকিয়ে ভিতরে ঢুকেছে। খুলে দিলে মুস্কি হেসে চলে গিয়েছে। কিন্তু তার হাতে তো লুঙ্গী দেখি নি। কিছুক্ষন পর বারান্দায় হই চই শোনা গেল। এগিয়ে গিয়ে দেখলাম চোর ধরে উত্তম মধ্যম দেয়া হচ্ছে। সে শিকার করল যে সব চুরিই সে করেছে। সে শুধু লুঙ্গী গামছা চুরি করে। চুরি করে একটা স্থানে লুকিয়ে জড়ো করে। সুযোগ বুঝে পোটলা বেধে নিচে ফেলে দেয়। তার এসিস্টেন্ট ওখান থেকে কুরিয়ে নিয়ে যায়। সে আরও কথা দিল যে তাকে ছেড়ে দিলে তার পার্টনার থেকে আমাদের লুঙ্গী গুলি রিটার্ন দিয়ে যাবে। আমরা বিশ্বাস করলাম না। হঠাত করে চোর বলে "আমি আগমু। আমাকে লেট্রিনে যেতে দিন। না দিলে এখানেই আগমু। " আমরা বাধ্য হয়েই তাকে লেট্রিনে যেতে দিলাম। এখন সে লেট্রিন থেকে বের হয়না। অনেক সময় কেটে গেল লেট্রিন থেকে বের হচ্ছে না। একে একে অনেকেই চলে গেল। লোকজনের কথা বার্তা শোনা না গেলে দরজা খুলে বের হল। দেখা গেল তার সারা গায়ে পায়খানা মাখানো। কেউ তাকে ধরার জন্য এগিয়ে না গিয়ে পিছিয়ে গেল। হোস্টেল ত্যাগ করে নিচের বটতলা পর্যন্ত গিয়ে দৌড় দিল। আর সাম নের দিকে হাত ইশারা করে ডাকতে লাগলো এই দাড়া দাড়া। যেন সিরিয়াসলি কাউকে ডাকছে আর দৌড়াচ্ছে। লুঙ্গী চোর বিশেষজ্ঞ চলে গেল।

পুরোদমে এম ফিল ক্লাস চলছে। প্রফেসর বি আর খান স্যার, এসোসিয়েট প্রফেসর বদরুল ইসলাম স্যার, এসিস্টেন্ট প্রফেসর মোহাম্মদ কামাল স্যার প্যাথলজি লেকচার ক্লাস নিতেন। প্রসেসর এম এ রশিদ স্যার, এসোসিয়েট প্রফেসর এম এ জলিল স্যার হেমাটোলজি লেকচার ক্লাস নিতেন। প্রফেসর শাহ আব্দুর রহমান স্যার বায়োস্টেটিস্টিক ক্লাস নিতেন। প্রফেসর সোহরাব আলী এবং এসোসিয়েট প্রফেসর ইকবাল আরসেলান স্যার বায়োকেমিস্ট্রি ক্লাস নিতেন। প্রতিদিন টিউটোরিয়াল ক্লাস থাকত। রুটিন স্লাইড গুলি দেখে ডায়াগনোসিস খাতায় লিখে রাখতে হত। স্যার স্লাইড সেসনে কি পেয়েছেন জিজ্ঞেস করতেন। আমরা আমাদের ডায়াগনোসিস স্যারের ডায়াগনোসিসের সাথে মিলিয়ে দেখতাম।

প্রতি বৃহস্পতিবার হিস্টোপ্যাথলজী স্লাইড সেমিনার থাকত। স্যারগন, বিশেষকরে কামাল স্যার জটিল জটিল স্লাইড নিয়ে আসতেন প্রাইভেট ল্যাব থেকে। প্রফেসর কে এম নজরুল ইসলাম স্যার ও প্রফেসর কামাল স্যার দি ল্যাবরেটরিতে প্রাইভেট প্রাক্টিস করতেন। নজরুল ইসলাম স্যার আমাদের স্যারগনের প্রায় সবারই স্যার। তিনি আমাদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশে ফাদার অব প্যাথলজি। অন্যান্য পোস্ট গ্রাজুয়েট বিষয়ের ছাত্ররা যারা তার প্যাথলজি ক্লাস করেছেন তারা তাকে বাংলাদেশে মেডিকেল সাইন্সের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসাবে বিচার করেন। তিনি আমার সরাসরি শিক্ষক না হলেও আমি তার কাছে এডমিশন টেস্ট ভাইবা দিয়েছি, এম ফিল ফাইনাল পরীক্ষার ভাইবা ও থিসিস ডিফেন্স দিয়েছি। অনেকবার তার নিকট হিস্টোপ্যাথলজিতে প্রশিক্ষণ নিয়েছি। বৃহস্পতিবারের স্লাইড সেমিনার পরিচালনা করতেন কামাল স্যার। আমাদেরকে এক সপ্তাহ আগে স্লাইড দেয়া হত। সবাই পড়া ও কাজের ফাকে সেমিনারের স্লাইড দেখতাম। একেকবাএকেক ডায়াগনোসিস মনে হত। যখন যেটা মনে হত তখন সেটা বই পড়ে মিলানোর চেস্টা করতাম। বইয়ের সাথে মিলত না। আবার দেখতাম। আরেক রকম ডায়াগনোসিস মনে হত। আবার পড়তাম। আবার মিলাতাম। মিলত না। আবার পড়তাম, আবার দেখতাম। এভাবে এক সপ্তায়ে বইয়ের গুষ্টি শুদ্ধ পড়ে ফেলতাম। বড় বড় ভারী ভারী বই কাধে নিয়ে ঘুরতাম। পড়ার চাপে দুনিয়ার সব কিছু ভুলে থাকতাম। অমানুষ হয়ে দিয়েছিলাম। বি আর খান স্যারের রুমে স্লাইড সেমিনার হত। স্যারে ডান পাসে বদরুল ইসলাম স্যার। বাম পাশে অসীম বরুয়া স্যার। সাইডে একটা এক গাদা বড় বড় বই নিয়ে বসতেন কামাল স্যার। দি কামাল স্যার। ব্যাঘ্র কামাল স্যার। তিনি এভাবে প্রশ্ন করতেন" ডক্টর কামরুল বলেন, আপনি কি পেয়েছেন?" কামরুল ভাই তার ডায়াগনোসিস বলতেন। আমরা সবাই টুলে বসতাম। কামরুল ভাই ছিলেন এম বি বি এস এ আমার চার বছরের সিনিয়র, এম ফিল এ দুই বছরের সিনিয়র। এখন অধ্যাপক কামরুল হাসান খান, মাননীয় ভাইস চেন্সেলর, বংগ বন্ধু শেখ মুজীব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। কামাল স্যার বলতেন "ডক্টর সাদেক কি পেয়েছেন।" আমার জিব্বা শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকত। কথা বের হতে চাইত না। তবু চেষ্টা করে কিছুটা বের করতাম। ভুল হলে স্যার উপরের ঠোট ভিতরের দিকে নিয়ে নিচের ঠোট চেপে ধরতেন। আমাদের সবার আত্বা শুকিয়ে যেত। বি আর খান স্যার ভ্রু কুচকিয়ে থাকতেন। বদরুল ইসলাম স্যার চিৎকার দিয়ে উঠতেন। বরুয়া স্যার আমাদের প্রতি দরদী ছিলেন। তার এক্সপ্রেশনে মনে হত তিনি আমাদের এই অবস্থার জন্য তিনি অনুতপ্ত। স্লাইড ডায়াগনোসিস শুদ্ধ হলে কামাল স্যারের দুই চোখের ভ্রু ডান দিকে ঢেউ খেলত। বি আর খান স্যার মৃদু হেসে বদরুল স্যারের দিকে তাকাতেন। বদরুল স্যারের মুখ উজ্জ্বল হত। বরুয়া স্যার কামাল স্যারের দিকে তাকাতেন। কামাল স্যার বলতেন "ডক্টর হারুন?" হারুন এক গ্লাস পানি খেয়ে গলা ভিজিয়ে বলার চেস্টা করত। মনোয়ার ভাইর দায়িত্ব ছিল সেমিনারের জন্য নাস্তার ব্যাবস্থা করা। তিনি শুক্না বিস্কুট আর চা দিতেন। শুক্না মুখে শুক্না বিস্কুট খাওয়া আমার জন্য খুবই কস্টের ছিল। মুখে নিয়ে বসে থাকতাম। না খেলেও মুস্কিল। না খেলে কামাল স্যার বলবেন "ডক্টর সাদেক, খাচ্ছেন না কেন"। আমি এক হাতে বিস্কুট খাই এক হাতে পানি খাই।

টিউটোরিয়াল ক্লাসের জন্য বদরুল স্যার একদিন ১৭ পৃসঠা পড়া দিয়ে দিলেল। কম বয়সের ছাত্ররা মুখস্ত করে আসল। আমার মুখস্থ করার বয়স নেই। তাই টিউটোরিয়াল ক্লাসে একটু দুর্বল মন নিয়ে বসতাম। কোন একটা রোগের প্রাদুর্ভাব কত পারসেন্ট জিজ্ঞেস করায় আমি বইয়ে লেখা থেকে দুই পারসেন্ট কম বলেছিলাম। তাতে স্যার রেগে গিয়ে বললেন "ছয় তলা থেকে ফেলে দেব, গুল মারেন?" আমি ছয় তলা থেকে ফেলে ফেলে দিলে নিচে টিন সেডে পড়ব না সিমেন্টের উপর পরব তা নিয়ে ভাবতাম। পড়ের ক্লাসে আরও বেশী করে পড়ে আসতাম। ফ্যামিলির প্রতি টেনশন কমাবার জন্য ফ্যামিলি টাংগাইল শিফট করলাম। চাচা শশুরের বাসার কাছে বাসা ভাড়া নিলাম। প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেলে টাংগাইল যেতাম। শনিবার ভোরে ফিরতাম। টাংগাইল থাকাকালে এম ফিল ভুলে থাকতাম। ফ্যামিলিকে পুর্ন সময় দিতাম। বৃহস্পতিবার আমার কাজ কমিয়ে দিতাম। ঐদিন পেরেশানির কাজ গ্রস এক্সামিনেশন করতাম না। জুনিয়রদের দিয়ে করায়ে নিতাম। তারা যাতে মাইন্ড না করে তার জন্য তাদেরকে বুঝাতাম"আমি আজ আপনাদের ভাবীর সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। পরিশ্রান্ত হলে আমাকে বিধ্যস্ত দেখাবে। তাতে তার মন খারাপ হতে পারে। অনুগ্রহ পুর্বক আমার কাজটি করে দিন। " কেউ কেউ সেই কথা আমাকে এখনো মনে করিয়ে দিয়ে হাসেন। আরও অনেক কথা আছে। সেসব এখনি লিখে আপনার ধৈর্য চুতি করব না। দ্বিতীয় অংশে লিখব।
=====
ডাঃ সাদেকুল ইসলাম তালুকদার
ফেইসবুক পোস্ট
স্মৃতি র পাতা থেকে
১৮/৭/২০১৭

আমার পিজিতে এম ফিল পড়া -২য় অংশ

এম ফিল প্যাথলজি কোর্সের প্রথম ছয় মাস ছিল প্রথম পর্ব। এই সময় জেনারেল প্যাথলজি, সিস্টেমিক প্যাথলজির অর্ধেক, বেসিক কেমিস্ট্রি, বেসিক বায়োকেমিস্ট্রি, হেমাটোলজি ও বায়োস্টেটিস্টিক ক্লাস করেছি। প্রথম পর্ব ভাল ভাবেই পাস করলাম। দ্বিতীয় পর্বও ছিল ছয় মাসের। ক্লাস করতে হয়েছে সিস্টেমিক প্যাথলজির শেষ অংশ, বায়োকেমিস্ট্রি ও হেমাটোলজি। এই পর্বও ভাল রেজাল্ট করে পাস করলাম। এক বছরের থিউরি ও প্রাক্টিক্যাল ক্লাস শেষ হল। এমবিবিএস পাচ বছরে যে পরিমান পড়েছি এম ফিল এ এক বছরে তার চেয়েও বেশী পড়েছি। এইবার থিসিস পর্ব এক বছর।গবেষণার পাশাপাশি রুটিন হিস্টোপ্যাথলজি রিপোর্ট করতে হবে।

এখানে একটা কথা মনে পরল। জুলাই ১৯৯৩ সনে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে ডেপুটেশনে আইপিজিএমআর-এ পড়তে আসার পরই আমাকে বদলী করা হল পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার চালিতাবুনিয়া উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। সেখান থেকে সংযুক্ত ডিজিএইচএস, ডেপুটেশনে আইপিজিএমআর। অর্ডার পেয়ে বাস যোগে ঢাকা থেকে পটুয়াখালী চলে গেলাম। সেখান থেকে ছোট লঞ্চে করে গলাচিপায় পৌছলাম সন্ধার দিকে। এক ঔষধের ফার্মেসীতে জিজ্ঞেস করে এখানকার টিএইচএ সাহেবের প্রাইভেট চেম্বারের ঠিকানা জেনে নিলাম। চেম্বারে গিয়ে পরিচয় দিলাম। তিনি রুগী নিয়ে ব্যাস্ত ছিলেন। আমি তার বাসার লোকেশন দেখায়ে দেবার জন্য তার এসিস্টেন্টকে চাইলাম। তিনি এসিস্টেন্টকে নির্দেশ দিলেন আমাকে হাসপাতাল কোয়ার্টারের ডর্মেটরিতে পৌছিয়ে দিয়ে অন্যান্য ডাক্তারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে। আমি বললাম "স্যার, আমাদের এম ফিল ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। আমাকে আগামীকালই ছেড়ে দিতে হবে।" স্যার রাজি হলেন। চেম্বার থেকে বের হয়ে এসিস্টেন্টকে বললাম "আমাকে একটা ভাল মিস্টির দোকানে নিয়ে চল। স্যারের বাসার জন্য মিস্টি নেব। " এসিস্টেন্ট বলল "স্যার বাসায় মিস্টি নেয়া পছন্দ করেন না। নেয়া যাবে না।" আমি বললাম "নিতে হবে।" এসিস্টেন্ট আমাকে নিয়ে আবার স্যারের চেম্বারে গিয়ে বলল "ইনি আপনার বাসায় মিস্টি নিতে চান।"

-না না। মিস্টি নিবেন না। কিচ্ছু লাগবে না।

-আমি আপনার বাচ্চাদের জন্য মিস্টি নেব। এটা আমার ভদ্রতা। কিছু মনে নেবেন না।

-ঠিক আছে। নেবেনই যখন তাহলে বাচ্চারা যা যা পছন্দ করে তাই কিনুন। ওরা মিস্টি পছন্দ করে। আমার দুইটি বাচ্চা, ছোট ছোট। লেইট মেরিজ করেছি তো। ওরা যা পছন্দ করে তা আমার এসিস্টেন্ট জানে।

আমি এসিস্টন্টের পরামর্শ অনুযায়ী বাচ্চাদের জন্য কিছু খাবার জিনিস নিয়ে কোয়ার্টারে গেলাম। রাতে ডর্মিটরিতে খেলাম, থাকলাম। এক ব্যাচেলার ডাক্তারের সাথে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প হল। সকালে নাস্তা করে হাসপাতালে গেলাম। টিএইচএ সাহেব সব ডাক্তারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার ভবিষ্যতের গুরুত্ব তাদের কাছে তুলে ধরলেন। তিনি আমার যোগদানপত্র ও রিলিজপত্র রেডি করে রেখেছিলেন। আমি শুধু সই দিলাম। কি যে ভাল লাগছিল! ঐদিনই ফিরে আসলাম। রাতে ঢাকায় পৌছলাম।

থিসিস পর্বে কিসের উপর রিসার্চ করব এখন তা সিদ্ধান্ত নেয়ার সময়। দুই রকম সাব্জেক্ট আছে। রুগীর সেম্পল ও এনিমাল এক্সপেরিমেন্ট। এনিমাল এক্সপেরিমেন্ট-এর সুবিধা হল ডিপার্টমেন্ট-এ বসেই রিসার্চ করা যায়। অসুবিধা হল খরচ বেশী ও এনিমাল ম্যানেজমেন্ট একটু ঝামেলাপূর্ণ। হিউম্যান সেম্পল-এর সুবিধা হল খরচ কম ও সেম্পল ম্যানেজমেন্ট সহজ। এর অসুবিধা হল সেম্পল সংগ্রহ করতে ল্যাবে ল্যাবে ঘুরতে হবে এবং সময়সাপেক্ষ। তখন আমাদের দুই বছরের সিনিয়র কামরুল ভাই এনিমাল এক্সপেরিমেন্ট করছিলেন। তিনি এখন বিএসএমএমইউ-এর মাননীয় ভিসি প্রফেসর কামরুল হাসান খান স্যার। তিনি সবার কাছে খুব প্রিয় ছিলেন। তিনি এনিমাল রুমের

ভিতরের দিকে একটি রুমে বসতেন। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। বিশেষ করে দুইটি কারনে। প্রথমটি হল আমরা দুইজনই ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলাম। তিনি এম-১৪, আমি এম-১৭। দ্বিতীয়টি হল আমি আমার সরকারি চাকুরীতে প্রবেশ করার পুর্বে যখন টাংগাইলের একমাত্র প্রাইভেট হাসপাতাল নাহার নার্সিং হোমে মেডিকেল ডাইরেক্টর ছিলাম তখন তিনি প্রাইভেট কলে নার্সিং হোমে আসতেন। তিনি মাইনর সার্জারি করতেন। মেজর সার্জারিতে এসিস্ট করতেন এবং ফলোআপ দিতেন। আমি সার্জারিতে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলাম। তিনি আমার নাম সংক্ষিপ্ত করে সিট বলে ডাকতেন (SIT - Sadequel Islam Talukder)। আমার কোন কোন সফটওয়্যার-এ আমি ব্যাবহার করেছি Developed by SIT. থিসিস পর্বে তিনি ইথিলিন গ্লাইকল এর হার্মফুল সাইড ইফেক্ট নিয়ে ইদুরের উপর এক্সপেরিমেন্ট করছিলেন। দেখা গেছে যে কিছুদিন আগে ১৭ জন শিশু পেরাসিটামল সিরাপ খেয়ে মারা গিয়েছে। ঔষধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি সস্তা মিস্টিকারী উপাদান ইথিলিন গ্লাইকল মিশিয়েছিল পেরাসিটামল সিরাপে। কামরুল ভাই এক্সপেরিমেন্ট করে দেখালেন যে ইহা খেলে ইদুরের লিভার ও কিডনি নস্ট হয়ে যায়। কাজেই শিশুদের বেলায়ও তাই হয়েছে।কামরুল ভাইর কাজ দেখে উদ্বুদ্য হয়ে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমিও এনিমাল এর উপর এক্সপেরিমেন্ট করব। আমার থিসিসের গাইড ছিলেন ডিপার্টমেন্ট-এর প্রধান অধ্যাপক বি আর খান স্যার। কো-গাইড ছিলেন এসোসিয়েট প্রফেসর বদরুল ইসলাম স্যার ও এম কামাল স্যার। বি আর খান স্যারের কাছে কোন পরামর্শ চাইলে তিনি কামাল স্যারের কাছে যেতে বলতেন। কাজেই বাস্তবে আমার গাইড ছিলেন কামাল স্যার। কামাল স্যারকে জানালাম "স্যার, আমি কৃষি কাজে ব্যবহারিত কিটনাশকের হার্মফুল ইফেক্ট নিয়ে ইদুরের উপর এক্সপেরিমেন্ট করতে চাই। " স্যার বলেন "করেন।" আমি লাইব্রেরিতে গিয়ে এই নিয়ে অনেক জার্নাল আর্টিকেল পড়ি। স্যারের নিকট এসে বলি। স্যার কয়েকটি আর্টিকেলের ফটোকপি আনতে বলেন। ফটোকপি নিয়ে আসি। স্যার পড়ে আমাকে কিছু প্রশ্ন করেন। উত্তর দিতে পারলে বলেন "গুড।" না পারলে চোখ রাংগীয়ে বলেন "যান লাইব্রেরী থেকে পড়ে আসেন। " আমি লাইব্রেরী থেকে পড়ে আসি। স্যারের কাছে এই এক্সপেরিমেন্ট পছন্দ হয় না। অথচ এই বিষয়ে পড়ে আমি অনেক জ্ঞান অর্জন করেছি, অনেক সময় নস্ট করেছি, ফটোকপি করে অনেক টাকা খরচ করেছি। আবার নতুন বিষয় খুঝি। মশার কয়েলের ধুয়ার ক্ষতিকর দিক নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করব। লাইব্রেরী থেকে ভাল করে পড়ে নিলাম। অনেক ফটোকপি করলাম। রেজাল্ট আগের মতই। স্যারের পছন্দ হয় না। মশার কয়েলের বিভিন্ন প্রকার, তার উপাদান, এর কার্যকারীতা, হিউম্যান লাংস এর উপর এর ক্ষতিকর দিক ইত্যাদি বিষয়ে আমার ব্যাপক ধারনা হল। অথচ আমার গবেষণায় কোন কাজে আসলো না। আমার সময় চলে যাচ্ছে, টাকার ক্ষতি হচ্ছে। লাভের মধ্যে জ্ঞান বাড়ছে। আবার নতুন বিষয় পড়া শুরু করলাম লাইব্রেরীতে গিয়ে। ইন্ডিয়ান রিসার্চারগন মসলার উপর বেশ কিছু রিসার্চ করেছেন। মসলার অনেক গুন চিকিৎসাক্ষেত্রে। শুরু হল মসলা নিয়ে গবেষণার যত আর্টিকেল আছে তা পড়া। পড়ি আর ফটোকপি করি। অনেক জ্ঞান অর্জন করলাম। কামাল স্যারের পছন্দ হল না। টেনশন শুরু হয়ে গেল। দুই মাস হয়ে গেল থিসিস বিষয় ঠিক করতে

পারলাম না। দেড়িতে শুরু করলে দেরীতে শেষ হবে। দেরীতে পাশ করতে হবে। শিক্ষা ডেপুটেশন মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। আবার পোস্টিং দিবে উপজেলায়। উপজ্বালায় পরব। উপজেলায় থেকে রিসার্চ করাও অসুবিধার। তাছাড়া তাড়াতাড়ি এম ফিল শেষ করে ফ্যামিলির কাছে ফিরতে হবে। ছোট ছোট দুই মেয়ে। বাসায় গেলে বাবাকে কাছে পেয়ে কত খুশী হয়! দুই মেয়ে দুই কাদের উপর মাথা রেখে শুয়ে শুয়ে কত গল্প শুনে, কত গল্প করে। স্ত্রীর ভালবাসা আর যত্নের কথা কি লিখা যায়? কাজেই আমাকে ডিউ টাইমে থিসিস শেষ করতে হবে।
এরপর শুরু করলাম মানুসের সেম্পল নিয়ে কিছু করা যায় কিনা। এমন সেম্পল নিতে হবে যেগুলি সহজে অল্প সময়ে অনেকগুলি পাওয়া যায়। একবার চিন্তা করলাম পুরুসের প্রস্টেট নিয়ে রিসার্চ করি। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গেলাম। ইউরোলজি বিভাগে গিয়ে একজন রেজিস্ট্রারকে জানালাম আমাকে কিছু প্রস্টেট বায়োপ্সি সেম্পল দেয়া যাবে কি না। তিনি বললেন "এ ব্যাপারে হাদী স্যারের কাছে যান।" তিনি প্রফেসর এম এ হাদী স্যার। তিনি পরে বিএসএমএমইউ-এর ভিসি ছিলেন। তার ওজন মাপার মত জ্ঞান আমার তখনও হয় নি। কাজেই নির্ধিধায় আমি তার রুমে গেলাম। সালাম দিয়ে সামনে বসলাম। তিনি বললেন "বলুন, আপনার জন্য আমি কি করতে পারি?"
-স্যার, আমি এম ফিল প্যাথলজি থিসিস পর্বের ছাত্র। প্রস্টেট স্পেসিমেন নিয়ে রিসার্চ করতে চাই। আপনি কি আমাকে কিছু সেম্পল দিতে পারবেন?
-তা তুমি প্রস্টেট সেম্পল দিয়ে কিসের উপর রিসার্চ করবে?
-স্যার, আমি এখনো রিসার্চ টাইটেল ঠিক করি নি।
-বোকা ছেলে।সেম্পলের কোন অভাব নেই। আগে থিসিস টাইটেল ঠিক করে আস।
আমি বোকা বনে ফিরে আসলাম। কি করা যায়? কিছুই ঠিক করতে পারি না। বি আর খান স্যারের কাছে গেলাম।
-স্যার, আমি এখনো আমার থিসিস টাইটেল ঠিক করতে পারলাম না।
-বারডেমে অনেক এন্ডোস্কোপিক বায়োপ্সি সেম্পল কালেকশন করা হয়। দেখেন কিছু করতে পারেন কিনা।

মনে মনে ঠিক করলাম হিস্টোপ্যাথলজিকেল প্যাটার্ন অব গার্স্ট্রিক লিশন দেখব। সাহস করে বার্ডেমে গেলাম। এনফোস্কোপি রুমে চার জন স্যার বসা ছিলেন। আমি সালাম দিয়ে পরিচয় দিলাম। বললাম
-স্যার, আমি এম ফিল প্যাথলজি থিসিস পার্টের জন্য রিসার্চ করতে চাই গ্যাস্ট্রিক বায়োপ্সি সেম্পল নিয়ে।
বিভাগীয় প্রধান বললেন
-কি বিসয়ে রিসার্চ করবেন?
-হিস্টোপ্যাথলজিকেল প্যাটার্ন দেখতে চাই।
-প্যাটার্ন দেখে কি হবে?

আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না। করুন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। স্যারগন তাদের কাজে ব্যাস্ত হয়ে গেলেন। আমি মন খারাপ করে বসে আছি। আমার পাসে আনিস স্যার বসা ছিলেন। তিনি এখন প্রখ্যাত গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট প্রফেসর আনিসুর রহমান স্যার। আনিস স্যার আমাকে আসতে আসতে বললেন জাপানে হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি নিয়ে বেশ রিসার্চ হচ্ছে। এই জীবানু নাকি গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার করে। আমাদের দেশে অনেক গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারের রুগী আছে তাদের সাথে এই জীবানুর এসোসিয়েশন আছে কিনা দেখতে পারেন। আপনি রিসার্চ করলে সেম্পল পাবেন। আপনি একটু হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি নিয়ে পড়াশুনা করুন।
আমি বার্ডেম, পিজি ও মহাখালী ন্যাশনাল লাইব্রেরী থেকে হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি ও গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারের উপর বেশ কিছু আর্টিকেল ফটোকপি করে এনে পড়ে ফেললাম। এবার একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছিলাম। বার্ডেমে গিয়ে আনিস স্যার তার সাথে যারা ছিলেন তাদের কাছে আমার রিসার্সের গুরুত্ব তুলে ধরলাম। তারা সবাই এপ্রিসিয়েট করলেন। আমি ফিরে এসে কামাল স্যারকে সব বললাম। কামাল স্যারও এপ্রিসিয়েট করলেন। বললেন
-এটি একটি ভাল রিসার্চ হবে। আপনি আমার সালাম দিয়ে আইপিজিএম আর গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিভাগের হেড প্রফেসর মাহমুদ হাসান স্যারের কাছে যান। তিনি এ ব্যাপারে অনেক হেল্প করতে পারবেন। আমি স্যারের কাছে গিয়ে পরিচয় দিয়ে আমার রিসার্চের কথা জানালাম। তিনি বললেন "অত্যান্ত ভাল কাজ। করতে পারলে ভাল। একটু বসেন। " আমি স্যারের সামনে বসলাম। স্যার খুব মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা লিখতেছিলেন। খুব সম্ভব আর্টিকেল হবে। মাঝে মাঝে দুই এক জন গেস্ট ঢুকেন। সবাইকে বসতে বলেন। সবার কাছেই একই কথা বলেন "ইনি ডাঃ সাদেকুল ইসলাম তালুকদার। হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি নিয়ে রিসার্চ করেন। আপনি একটু বসেন। " এতটুকু বলেই গেস্টের সাথে কথা বলে গেস্টকে বিদায় করে দিয়ে আবার লিখতে বসেন। আমি নিখুঁতভাবে স্যারকে পর্যবেক্ষন করি। স্যারের কথায় নিজেকে রিসার্চার মনে হচ্ছিল। স্যার একটু পর পর আমাকে বলেন "একটু বসেন। " আমি বসে থাকি। ভালই লাগে বসে থাকতে। স্যারের রুমে যত বেশী সময় কাটানো যায় ততই প্রেস্টিজের ব্যাপার। এক সময় তিনি আমার সব কথা শুনলেন। বললেন "আপনি রিসার্চ প্রটোকল লিখা শুরু করেন। আমি আপনাকে হেল্প করব। " আমি প্রটোকল লিখার জন্য পড়াশুনা শুরু করে দিলাম। একাজে বি আর খান স্যার, বদরুল স্যার, কামাল স্যার, মাহমুদ হাসান স্যার ও আনিস স্যার সহযোগীতা করলেন। একদিন সকাল ৯ টায় আমার প্রটোকল প্রেজেন্টেশন করার দিন ধার্য হল। আমি মাহমুদ হাসান স্যারকে বললাম "স্যার, আমি আগামীকাল আমাদের ডিপার্টমেন্ট-এ আমার রিসার্চ প্রটোকল প্রেজেন্ট করব। আপনি থাকবেন স্যার?" স্যার বললেন "দেখি, চেস্টা করে দেখব। " আমি ৯ টার আগেই সেমিবার কক্ষে গেলাম। দেখি মাহমুদ হাসান স্যার বসে আছেন। একে একে সব ছাত্র ও শিক্ষক আসলেন। আমি প্রোটকল প্রেজেন্ট করলাম। বদরুল স্যার খুব রেগে গেলেন। কামাল স্যার আমার বাচন ভঙ্গির ত্রুটি ধরে সমালোচনা করলেন। আমার মন ভেংগে গেল। মাহমুদ হাসান স্যারকে কমেন্ট করতে বলা হল। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। স্যার অত্যন্ত নরম সুরে

কথা বললেন। তিনি বললেন "তার রিসার্চটি অত্যন্ত সুন্দর হবে। খুবই এপ্রোপ্রিয়েট থিসিস হবে। আই এপ্রিসিয়েট হিজ ওয়ার্ক। সে সুন্দর বলেছে। যেহেতু তার মাত্র শুরু সে হিসাবে ঠিকই আছে। ওর মত আমিও প্রথম প্রেজেন্টেশন করার সময় ভাল করতে পারিনি। আসতে আসতে ইম্প্রুভ হয়ে যাবে।" আমি আবার নতুন জীবন ফিরে পেলাম। বি আর খান স্যার তেমন কিছু বললেন না। মাহমুদ হাসান স্যার চলে গেলেন। আমি বি আর খান স্যারের রুমে গেলাম। স্যার বললেন "আপনি মাহমুদ হাসান সাবকে সেমিনারে দাওয়াত দিয়েছিলেন? "
-জি স্যার।
-তাকে দাওয়াত দেয়ার কথা আমাকে বলেন নি কেন? তিনি আসবেন জানলে আমরা তাকে ভাল ভাবে আপ্যায়ন করতে পারতাম। আমরা তাকে মাত্র চা বিস্কুট খাওয়ালাম । কি লজ্জার কথা।
-আমি তাকে বলেছিলাম তিনি থাকতে পারবেন কিনা। তিনি কনফার্ম করে কিছু বলেন নি। আমার ধারনা ছিল তিনি আসবেন না। আমি অত্যন্ত দু:খিত, স্যার।

এনিয়ে বদরুল স্যার ও কামাল স্যারও আমাকে তিরস্কার করলেন। সে রাতে বেশী করে ঘুমালাম। শুরু হল আমার থিসিসের আসল পর্ব। থিসিস টাইটেল "এসোসিয়েশন অব হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি উইথ গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার এন্ড আদার গ্যাস্ট্রোডিওডেনাল লিসন। " এন্ডোস্কোপিক বায়োপ্সি সেম্পল কালেকশন করতে হবে গ্যাস্ট্রিক ও ডিওডেনাল মিউকোসা থেকে। এক অংশ থেকে হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি জিবানু কালচার করতে হবে। আরেক অংশ দিয়ে হিস্টোপ্যাথলজিক্যাল স্লাইড তৈরি করে বিভিন্ন স্টেইন করে মাইক্রোস্কোপিক পরীক্ষা করে জিবানু দেখতে হবে এবং হিস্টোলজিক্যাল রোগ নির্নয় করতে হবে। শেসে স্টেটিস্টিক্যাল এনালাইসিস করে দেখতে হবে যে এই জিবানোর সাথে গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার ও অন্যান্য গাস্ট্রিক ও ডিওডেনাল রোগের সম্পর্ক আছে কিনা।
[চলবে]
=====
ডাঃ সাদেকুল ইসলাম তালুকদার
ফেইসবুক পোস্ট
স্মৃতির পাতা থেকে
২৯/৭/২০১৭

আমার পিজিতে এম ফিল পড়া - ৩য় অংশ

থিসিস পর্বের রিসার্চের কাজ শুরু হয়ে গেল। হিস্টোপ্যাথলজিক্যাল স্লাইড প্রসেসিং আমাদের ডিপার্টমেন্ট এর প্যাথলজি ল্যাবে করা সম্ভব। হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি কালচার করার জন্য

মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব প্রয়োজন। আইপিজিএমআর-এর মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব এ কাজে আমাকে হেল্প করতে পারল না। কোন একজনের পরামর্শে আমি মহাখালীস্থ আইসিডিডিয়ারবি মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের প্রধানের নিকট গেলাম। জানালাম
-স্যার, আমার এম ফিল থিসিস কাজের রিসার্চের জন্য গ্যাস্ট্রিক বায়োপ্সি থেকে হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি অরগানিজম কালচার করা প্রয়োজন। আপনি কি আমাকে হেল্প করতে পারবেন?
স্যার আমাকে হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি, বিভিন্ন কালচার মিডিয়া, কালার এনভায়রনমেন্ট ইত্যাদি নিয়ে পর পর অনেক প্রশ্ন করলেন। আমি তার অর্ধেক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম। কারন, আমি তো মাইক্রোবায়োলজির ছাত্র না।

স্যার তিরস্কারের সুরে বললেন
-এতটুকু মাইক্রোবায়োলজির নলেজ নিয়ে আমার কাছে এসেছেন! যান ভাল করে জেনে আসুন।

আমি অপমানিত অনুভব করে মুখ লাল করে ফিরে আসলাম। এই অপমানের কথা কাউকে জানালাম না। মাইক্রোবায়োলজি টেক্সট বই পড়া শুরু করলাম। পড়তেই থাকলাম। পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে গেলাম। এর মধ্যে বার্ডেম ও আইপিজিএমআর-এর গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্টস ও বার্ডেম এর মাইক্রোবায়োলজিস্টগন মিলে একটা "হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি রিসার্চ গ্রুপ" গঠন করলেন। বার্ডেম কনফারেন্স রুমে প্রফেসর এ কে আজাদ স্যারের সভাপতিত্বে প্রথম সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। আমি আমার মতামত ব্যাক্ত করে বললাম "আমাকে যদি বর্ডেম ল্যাবরেটরি ব্যবহার করার সুজোগ দেয়া হয় তাহলে আমি হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি কালচার করতে সহযোগীতা করতে পারব। গ্রুপ আমাকে অনুমতি দিলেন। মিটিং-এ গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট মিয়া মাসুদ ভাই উপস্থিত ছিলেন। তিনি মিটিং-এর পর আমাকে বললেন "আমি পিএইচডি করার জন্য ডাটা কালেকশন করছি। আসুন কিছু কাজ আমরা যৌথ ভাবে করি। " আমি রাজি হলাম। গার্স্ট্রিক সেম্পল দেয়া, কালচার সুপারভাইজ করার কাজে মাসুদ ভাই সহযোগীতা করলেন। আমি হিস্টোপ্যাথলজি স্লাইড প্রসেসিং ও রিপোর্ট করার কাজে তাকে সহযোগীতা করলাম। হাটখোলা রিএজেন্ট মার্কেট থেকে কালচার করার জিনিস পত্র কিনে নিলাম। বিএমএ ভবনের নিচের মার্কেট থেকে কালচার মিডিয়া ও রিএজেন্ট কিনে নিলাম। বার্ডেমের টেকনোলজিস্টকে হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি কালচার করার পদ্ধতি বলে দিলাম। আমরা কেউ এ জীবাণু আগে কালচার করি নি। মেনুয়াল পরে শুরু করলাম। কালচার করতে বিশেষ এনভায়রনমেন্ট ও বিশেষ মিডিয়ার প্রয়োজন। নিজেকে বিজ্ঞানী বিজ্ঞানী মনে হল। প্রথম ব্যাচের কয়েকটি সেম্পল-এর মধ্যে একটিতে এই জীবানু গ্রো করল। আমাদের আনন্দ ধরে রাখা যায় না। এই সময় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মাইক্রোবায়োলজির শিক্ষক আসলেন। তিনি জাপানে পিএইচডি করছিলেন। তিনিও এই গ্রুপে ইনক্লুডেড হলেন। মিটিং হল। সবাই খুশী। গেস্ট শিক্ষক জীবানু দেখলেন। তিনি জাপানে এটা আইসোলেট করেছেন। এটাই

হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি। তিনি বললেন "আমি এই বাংলাদেশের আইসোলেটেড জীবানু জাপানে নিয়ে যাব।সেখানে ওখানকার জীবানুর সাথে কম্পেয়ার করব।
প্যাথলজি ল্যাবে হিস্টোপ্যাথলজিকেল স্লাইড তৈরি করে রুটিন হিমাটক্সিলিন ইউসিন স্টেইন করে রোগ নির্নয় করা হল। এই জিবানুর জন্য স্টোমাকে ইন্টেস্টিনাল মেটাপ্লাসিয়া হয়। এই মেটাপ্লাসিয়া দেখার জন্য স্পেশাল স্টেইন করা হত এলসিয়ান ব্লু স্টেইন। আমাকে টেকনিক্যাল কাজে খুব সহযোগীতা করেছে রুহী দাস। আমি তার কাজের মর্যাদা টাকা দিয়ে দেই নি। তার সাথে বন্ধুর মত আচরণ করেছি। সে খুশী মনেই আমার কাজ করে দিয়েছে। কেউ কেউ মনে করেছে আমি হয়ত তাকে টাকা দেই। অফিস পিওন আমানুল্লাহ আমার খুব প্রিয় ছিল। আমি কাউকে কোন দিন তার প্রতি অসন্তুষ্ট হতে দেখি নি। পাস করে আসার পর মাঝে মাঝে ডিপার্টমেন্ট-এ গেলে আমি আমানুল্লাহ কে খুঝি। একদিন আমানুল্লাহ কে দেখতে অফিস রুমে ঢুকলাম। আমানুল্লাহ আমার কুশলাদি জানার পর একটি ব্লাডের রিপোর্ট দেখালেন। আমি বললাম
-এটা কার রিপোর্ট?
-আমার, স্যার।
আমি দেখলাম রিপোর্ট লিখা আছে একুট লিউকেমিয়া, মানে ব্লাড ক্যান্সার। আমি নিরবে রিপোর্ট-এর দিকে চেয়ে চেয়ে তার পরিনতির কথা ভাবছিলাম।
-স্যার, রিপোর্ট কেমন?
-কেন,আপনি জানেন না?
-আমি তো এই মাত্র রিপোর্ট নিয়ে আসলাম। কাউকে দেখাই নি। রিপোর্ট কেমন?
-আপনার শারীরিক সমস্যা কি?
-তেমন কিছু না। একটু চেক করলাম।
-আপনার তো কঠিন রোগ হয়েছে।
-কি রোগ?
-খুবই খারাপ রোগ। এটাকে ব্লাড ক্যান্সার বলা হয়। তবে চিকিৎসায় ভাল হয়ে যাবে।

আমানুল্লাহর কপালে চিন্তা চিহ্ন দেখা গেল।
হঠাত করে রিপোর্টে রুগীর নাম চোখে পরল। নাম লিখা "আব্দুল্লাহ। "

-আরে এটাতো দেখছি আব্দুল্লাহর রিপোর্ট!

আমানুল্লাহ ছো মেরে আমার হাত থেকে রিপোর্ট নিয়ে চলে গেলেন। একটু পর ফিরে এসে বললেন
-স্যার, ভুল হয়ে গেছে।
-কি ভুল হয়েছে?
-আমি নিজেই ডেলিভারি ডেস্ক থেকে আমার নাম মনে করে আব্দুল্লাহর রিপোর্ট নিয়ে এসেছিলাম।

এই নিন আমার রিপোর্ট।
-আপনার রিপোর্ট ভাল।
আমানুল্লাহ মুস্কি হাসলেন।
গত কয়েকদিন আগে একটা অনুসঠানে আমানুল্লাহ র সাথে দেখা হয়। দেখলাম বেশ রোগা রোগা। বললাম
-কেমন আছেন।
-স্যার, বেশ দুর্বল। হাটতে কষ্ট হয়। ডায়াবেটিস হয়েছে।
-কোথায় আছেন?
-পংগু হাসপাতালে।
-এখন আকু পাংচার করেন না?
(আমানুল্লাহ আগে আকু পাংচার সেন্টারে প্রাইভেট চাকুরী করতেন।তিনি নিজে পাংচার করতেন।আমি জানতাম)
-ওটা বাদ দিয়েছি।
-আপনার নিজের শরীরে আকু পাংচার করেন নাই?
-করেছি। কাজ হয় নি।
আমানুল্লাহ র জন্য খারাপ লাগল। সে পংগু হয়ে এখন হাসপাতালে সময় কাটাচ্ছে।

এক ঘন্টা পর আবার দেখা হল।
-আপনি এখন কোথাও চাকরি করেন না?
-করি তো। পংগু হাসপাতালে।
- ও তাই? আমি ভেবেছিলাম পংগু হয়ে হাসপাতালে আছেন।
আমানুল্লাহ মুস্কি হাসলেন।

রিসার্চের মুল কাজ শুরু করে দিলাম। আইপিজিএমআর ও বার্ডেমের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিভাগের এন্ডোস্কোপি সেন্টার থেকে গাস্ট্রিক মিউকোসা সংগ্রহ করি। এর এক অংশ দিয়ে ডাইরেক্ট স্মিয়ার করে মডিফায়েড জিয়েমসা স্টেইন করে মাইক্রোস্কোপি করে হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি ডিটেক্ট করি। এক অংশ থেকে বার্ডেমের মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবে হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি কালচার করি। এক অংশ দিয়ে হিস্টোপ্যাথলজি স্লাইড তৈরি করে হিমাটক্সিলিন-ইউসিন স্টেইন করে ডিজিজ ডায়াগনোসিস করি, মডিফাইড জিএমসা স্টেইন করে হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি ডিটেক্ট করি এবং এলসিয়ান ব্লু-পিএএস স্টেইন করে ইন্টেস্টিনাল মেটাপ্লাসিয়া দেখি। কামাল স্যার, বদরুল ইসলাম স্যার ও বি আর খান স্যারকে দিয়ে স্লাইড রিভিউ করাই। সব স্যারগন আমার কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেন। আমার ভাল লাগে। রুটিন কাজ হিসাবে হিস্টোপ্যাথলজি রিপোর্ট করি এবং লাইব্রেরী

থেকে আর্টিকেল কালেকশন করে পড়ি। ফাকে ফাকে থিসিস লিখি। লিখি পড়ি আর কাটি। কিছু কাটেন কামাল স্যার আর কিছু কাটেন বদরুল স্যার। আবার লিখি। আবার কাটা কাটি। একসময় কাটাকাটি শেষ হয়। তখন ভাল লাগে।
প্যাথলজি সোসাইটির বার্ষিক সম্মেলন হয়েছিল সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজে। তখন প্রিন্সিপাল ছিলেন প্রফেসর কিব্রিয়া স্যার। প্রধান অতিথি ছিলেন প্রেসিডেন্ট আব্দুর রাজ্জাক। ওখান থেকে আমরা জাফলং বেড়াতে দিয়েছিলাম। আমার বিশেষ করে মনে পরছে যে কামাল স্যারকে বাঘের মত ভয় পেতাম সেই কামাল স্যারকে দেখলাম কিশোরের মত আনন্দ করছেন। অসীম স্যার যখন হাটু পানিতে নেমে আনন্দ পেতেছিলেন তখন কামাল স্যার পাথর দিয়ে পাশের পানিতে ঢিল ছুড়ছিলেন। আমরা ছাত্ররা তাতে খুব মঝা পেতেছিলাম। ট্রেনে ফেরার সময় মাইক্রোবায়োলজির প্রফেসর মশিউর রহমান স্যার সীটের কাছে একটি বাশের মোথা রেখেছিলেন। তিনি এটা তার বাড়ীতে লাগাবেন বলে সিলেট থেকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কোন একজন স্যার মশিউর রহমান স্যারকে বলছিলেন "স্যার, এই বাশ আপনার বাসায় না লাগিয়ে পিজির সামনে লাগায়েন। " এই কথার অর্থ তখন যারা পিজিতে পড়েছেন তারা বুঝে ফেলেছেন। আমি গল্পে লিখতে পারব না।

থিসিস কর্ম শেষ হল। লিখা শেষ হচ্ছে না। পালাক্রমে একটি কম্পপিউটার দিয়ে ৫ জন থিসিস টাইপ করি। ভাইভার জন্য পড়তে হয়। শেসের দিকে সারারাত ডিপার্টমেন্ট এ কাটাতে হত। সাধারণত আমি ও নব কুমার এক সাথে কাজ করতাম। এক রাতে তিনটা বেঝে গেল। বের হতে গিয়ে দেখি গেইটে তালা মারা। তার মানে সারারাত ডিপার্টমেন্ট এ কাটাতে হবে। পিছনে অন্ধকার থেকে নিশাচর একজন ছেলে বলে ফেলল "বের হবেন নাকি?"
-কেমনে বের হব।
-আছে, আমাদের জানা আছে।
-আসেন।
দেখলাম অন্ধকারে পিজির এক কোনে এককি ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্র দিয়ে আমরা বেজীর মতো করে বের হয়ে আসলাম।তার মানে এই লোকগুলি এই ছিদ্র দিয়ে আনাগুনা করেন। পরে এক রাত জেগে কাজ করছিলাম আমি আর নব কুমার। রাত তখন প্রায় তিন বা চারটে । বাহিরে অনেক লোকের কথা শোনা গেল। কান পেতে শুনতে পেলাম এক চোর পাইপ বেয়ে আমরা যে বিল্ডিং এ ৫ তলায় কাজ করছি সেই বিল্ডিং এ উপরের দিকে উঠছে। আমরা চলে চাওয়ার জন্য লাইট বন্ধ করলাম। লোকগুলি বলছে "ভিতরে আরও দুইজন চোর আছে। আমাদের কথা শুনে বাতি নিভিয়ে দিয়েছে। " আমরা শুনে ভয় পেয়ে গেলাম। যদি এই মুহুর্তে বের হই তাহলে তারা আমাদেরকে গণপিটুনি দিতে পারে। যেহেতু গেইটে তালা দেয়া আছে আমরা চুপ্টি করে ভিতরের দিকের রুমে গিয়ে বসে রইলাম। লোকগুলি চলে গেলে চোর হউক বা পাগল হউক হয়ত নেমে চলে গেছে। আমরাও তালা খুলে বের হয়ে এলাম।

আরেক রাত আনুমানিক ৪ টার দিকে ডিপার্টমেন্ট-এ কাজ করার সময় আমাদের পাশের রুমের নিচ থেকে লোকজনের কথা শুনতে পেলাম। তাকিয়ে দেখি পাশের বিল্ডিং-এ জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে এক নার্স ফাশী দিয়ে ঝুলছে। ভয় পেয়ে গেলাম। কাজ বন্ধ না করে চালিয়ে গেলাম। কারন সামনে ফাইনাল পরীক্ষা।
থিসিস টাইপের কাজ শেষ হল। সম্পুর্ন থিসিস বই নিজেই টাইপ করেছি। মাউস ছাড়া শুধু কিবোর্ড দিয়ে। তিনটি বই প্রিন্ট করে বাধাই করতে হবে। খরচ কমানোর জন্য আমি ও নব কুমার পুরান ঢাকা থেকে অফসেট পেপার কিনে আনলাম। ডট প্রিন্টারে প্রিন্ট করলাম। নীলখেত থেকে বাধাই করে আনলাম। প্রথম পাতায় সব গাইডগনের সই লাগবে। ইতিমধ্যে প্রধান গাইড বি আর খান স্যার অবসরে গেছেন। কো-গাইড বদরুল ইসলাম স্যার বদলী হয়েছেন। আমি ও নব কুমার রিক্সা করে ধানমন্ডিতে বি আর খান স্যারের বাসায় গেলাম। স্যার আমাদের দেখে খুশী হলেন। সোফায় বসে অনেক্ষন গল্প করলেন। ভাল আপ্যায়ন করালেন। সই করলেন। দোয়া করলেন। আমরা ধন্যবাদ জানালাম। মনে মনে স্যারের জন্য দোয়া করলাম। মুগ্ধ হয়ে চলে এলাম। পরেরদিন ইস্কাটনে বদরুল ইসলাম স্যারের বাসায় গেলাম। তিনিও ঠিক বি আর খান স্যারের মত আপ্যায়ন, গল্প, দোয়া করলেন। আমরা মুগ্ধ হয়ে চলে এলাম।

বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল (বিএমআরসি) রিসার্চ গ্রান্ট দেয়ার জন্য দরখাস্ত আহ্বান করল। আমি দরখাস্ত করলাম। আমি ২০,০০০ টাকা গ্রান্ট পেয়েছিলাম।

অবশেসে থিসিস ফাইনাল পরীক্ষা হল। ভাইভা ও থিসিস ডিফেন্স পরীক্ষা দিলাম। পরীক্ষা নিলেন প্রফেসর কে এম নজরুল ইসলাম স্যার, প্রফেসর বি আর খান স্যার, প্রফেসর ফারুক আজিম স্যার, প্রফেসর শাহ আব্দুর রহমান স্যার ও প্রফেসর সোহরাব আলী স্যার। পরীক্ষায় স্যারগন সন্তুষ্ট হলেন। পরীক্ষা শেসে আমাদের ভিতরে নিয়ে স্যারগন কোলাকুলি করলেন। আমরা কোলাকুলির অর্থ জানতাম পাস। যিনি ফেল করতেন তাকে ভিতরে ডাকা হত না। দুই বছরের কস্টের জীবনের অবশান হল। এবার ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে রেজাল্ট বের হবার অপেক্ষা। কামাল স্যার বললেন "আপনার থিসিসের কাজটা বেশ বড় হয়েছে। এর সাথে কয়েকটা কেইস যোগ করে আপনি পিএইচ ডি করতে পারেন। আমার পিএইচডি করা আছে।আপনি ঢাকা ইউনিভারসিটিতে পিএইচ ডি করার জন্য দরখাস্ত করেন। অনুমতি পেলে আমি আপনার পিএইচডির গাইড হতে পারি। আপনার থিসিস থেকে আর্টিকেল লিখেন জার্নালে প্রকাশ করার জন্য। আমি হা না কিছু বললাম না।

আমি ভাবতে লাগলাম। আবার কোর্সে ঢুকব? আবার পড়াশুনা? আবার গবেষণা? আবার পরিবার থেকে দূরে? এখন পরিবারের সাথে সময় দিতে হবে। ছোট ছোট দুই মেয়ে। বিছানায় শুতেই কাছে এসে যায়। ছোট ছোট গল্প করে। দুইজন দুই পাশে শুয়ে আমার কাদের উপর মাথা রাখে। বাসা থেকে বের হবার সময় কাড়াকাড়ি করে মাথা পেতে দেয় মাথায় চুমু দেয়ার জন্য। স্ত্রীর হাতের নানা

রেসিপির মজাদার রান্না। আরও কত কি! এসব বাদ দিয়ে জার্নালের পিছনে দৌড়ানো? স্পেসিমেন কালেকশন করে বেড়ানো? না, চলেই যাই। প্রাইভেট প্রাক্টিস শুরু করে দেই। এখন বাবাকে দেয়ার সময়। এতদিন বাবার কাছ থেকে নিয়েছি। আর না। বাবাকে দিব। বাবা ইচ্ছামত খরচ করবেন। নিজের প্রয়োজন না থাকলে প্রিয়জনদের দিবেন। বাসার ভিতর ফার্নিচার প্রয়োজন। বাড়ী করার জন্য জমি কিনতে হবে। ইত্যাদি ভেবে আমি কামাল স্যারের কথাকে গুরুত্ব না দিয়ে ঢাকা ত্যাগ করে টাংগাইল চলে গেলাম। কিছুদিন একটা ডায়াগনোস্টিক সেন্টারে প্রাক্টিস করলাম। ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে অফিসিয়াল রেজাল্ট বের হল ডিসেম্বরে, ১৯৯৫ সনে। অফিসিয়ালি আমার গবেষণাকর্ম স্বীকৃতি পেল। আমি প্রমান করলাম হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি নামের এক জীবানু বাংলাদেশী রোগীদের স্টোমাকে ও ডিওডেনামে পাওয়া যায় এবং এই জীবানুর সাথে স্টোমাক ক্যান্সার, গ্যাস্ট্রাইটিস, ও পেপ্টিক আলসারের এসোসিয়েশন আছে। থিসিস শুরুর আগেও আমি এই জীবানুর নাম জানতাম না। এমনকি পাকস্থালীতে জীবানু থাকে বলেও আমি জানতাম না। আমার গবেষণার ফলাফল "Association of Helicobacter pylori with gastric cancer and other gastroduodenal leions" নামে বাংলাদেশ জার্নাল অব প্যাথলজি ১৯৯৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে লেকচার পোস্টে পদায়ন করার জন্য দরখাস্ত করলাম। শাহ মনোয়ার স্যার তখন ডিডি এডমিন ছিলেন। স্যারের সহযোগীতায় আমার দরখাস্ত মঞ্জুর হলো। ২৭ শে মার্চ ১৯৯৬ তারিখে আমি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে প্যাথলজি বিভাগে আবার প্রভাষক পদে যোগদান করলাম।

=====

ডাঃ সাদেকুল ইসলাম তালুকদার
ফেইসবুক পোস্ট
স্মৃতির পাতা থেকে
১০/৮/২০১৭